KATHOPOKATHAN - ATIT O BARTAMAN
DOUBLE-BLIND PEER-REVIEWED JOURNAL
Website – kathopokathan.in Email - kathopokathanjournal@gmail.com
Volume : 02, Issue :01, (January - June) 2025
Published On 28th March 2025

কোথায় ছিল প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর!

প্রভাত নস্কর
পি এইচ.ডি গবেষক
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সারসংক্ষেপ:

চীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষে প্রভাব বিস্তাকারী ছিল এই ঐতিহ্যশালী বন্দর (বন্দর নগরী) তাম্রলিপ্ত। কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকলেও প্রাচীন সাহিত্য ও লেখমালায় বর্ণিত ও বহু চর্চিত। প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও বেশ কিছু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও পুরাণ, চীনা পরিব্রাজকদের লিখিত গ্রন্থ, টলেমী জিওগ্রাফিতে হিউশেগ্রাফি এরূপ আরো বেশ কিছু প্রাচীন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া গেলেও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের স্বল্পতার কারনে বর্তমান গবেষকদের মনে নানা প্রশ্নের জাগে। সেই সব প্রশ্নের উত্তর এই গবেষণা পত্রে অনুসন্ধান করার চেষ্ঠা করা হয়েছে।

সূচক শব্দ- প্রাচীন, তাম্রলিপ্ত, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সমুদ্র, বাণিজ্য, উপদ্বীপের।

মূল বিষয়

আলোচ্য নিবন্ধটিতে প্রাচীন বাংলার (ভারতের) সামুদ্রিক বাণিজ্যের তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবদান এবং বর্তমান ভূমিরূপের নিরিখে এই বন্দরের অবস্থান চিহ্নিতকরণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই বন্দর কেবলমাত্র বাণিজ্যিক দ্রব্য আমদানী-রপ্তানীর মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি ঘটাতে সহায়তা করেনি। প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিশেষে প্রভাব বিস্তাকারী ছিল এই ঐতিহ্যশালী বন্দর (বন্দর নগরী) তাম্রলিপ্ত। কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকলেও প্রাচীন সাহিত্য ও লেখমালায় বর্ণিত ও বহু চর্চিত ও বিখ্যাত এই বন্দরের অবস্থান বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক অঞ্চলের সাথে অভিন্ন রূপে ধরা হয়। সাহিত্যিক বিবরণ ও প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীর নিরিখে অনুমান করা যায়, প্রাচীন বাংলার অবলুপ্ত এই বন্দর ইতিহাস পূর্বকাল (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক বা তারও আগের) থেকে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও বেশ কিছু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও পুরাণ, চীনা পরিব্রাজকদের লিখিত গ্রন্থ, টলেমী জিওগ্রাফিতে হিউশেগ্রাফি এরূপ আরো বেশ কিছু প্রাচীন গ্রন্থ তথা লেখকদের প্রাচীন বাংলার বন্দরকেন্দ্রীক বাণিজ্য সংক্রান্ত বিবরণীকে মৌলিক প্রামাণ্য তথ্যরূপে ওই আলোচ্য গবেষণাকল্পে গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী এক বিলুপ্ত রাজ্য ও বন্দর হল তাম্রলিপ্ত। প্রাচীন সাহিত্য ও লেখমালায় বর্ণিত বহু চর্চিত ও বিখ্যাত শহর বা নগরের এলাকা বর্তমানকালে মানচিত্রের নিরিখে নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যায় না। অনুরূপ অনিশ্চয়তা খানিকটা অতীতের গুরুত্বপূর্ণ শহর ও পোতাশ্রয় তাম্রলিপ্ত সম্পর্কেও প্রযোজ্য। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় এর মতে, মহাভারত, পুরাণ হতে আরম্ভ করে টোডরমল্ল পর্যন্ত নানাগ্রন্থে-

তাম্রলিপ্তি, তাম্রলিপ্ত, তামলিপ্তি, তাম্রলিপ্তক, তমালিনী, বিষ্ণুগৃহ, স্তম্বপুর, তামলিকা, বেলাকুল, তামোলিত্তি, দামলিপ্ত, টামালিটেস, টালকটেই, তম্বুলক ইত্যাদি নানা নামে তাম্রলিপ্ত বন্দরের বাণিজ্য সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।[১] তৃতীয় শতকে কং-তাই রচিত ফু-নানা-চুয়ান গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুসারে তি' এন-চু বা ভারতের নদী হুয়াং-চিবা গঙ্গার মোহনা অঞ্চলে ছিল তান-মেই অর্থাৎ তাম্রলিপ্ত রাজ্য।[১(ক)] মৌর্য সম্রাট অশোক এর লেখ থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক নাগাদ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পিতা অশোককে প্রণাম করে কন্যা সঙ্ঘমিত্রা ও পুত্র মহেন্দ্র (মতান্তরে ভাই) তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে সিংহলে যাত্রা করেন[২] (আধুনিক শ্রীলঙ্কা)। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে যে বন্দরের খ্যাতি দেখতে পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই সেই বন্দরের জন্ম তার পূর্বে। ফা-হিয়েনের মতে, তো-মো-লি-তি বা তাম্রলিপ্তি রাজ্যের রাজধানী অর্থাৎ তাম্রলিপ্ত নগরী একটি 'সামুদ্রিক বন্দর'।[৩] সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পদে সুয়ান-সাং তান-মো-লি-তি রাজ্য বা তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অবস্থান সমতটের অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি ও কুমিল্লা অঞ্চলের বেশ কিছুটা পূর্বে, কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অর্থাৎ বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটি সন্নিহিত এলাকাসহ এক ভূখণ্ডের বেশ কিছুটা দক্ষিণে এবং উ-তু বা বর্তমান উড়িষ্যা রাজ্যের উত্তর-পূর্ব উপকূলভাগের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বলে লক্ষ করেছিলেন।[৪] সুয়ান-সাং-এর বিবরণ বর্তমান মেদিনীপুর জেলা তমলুক অঞ্চলকে চিহ্নিত করে।

তমলুক এলাকায় ১৯৫৪-৫৫ এবং ১৯৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে শুরু করে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত এবং পাল যুগ পর্যন্ত এই এলাকায় মানুষের বসবাসের সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান।[৫] সুয়ান-সাং-এর বিবরণ অনুযায়ী তাম্রলিপ্ত রাজ্যের পরিধি ছিল ১৪০০ লি এবং এই রাজ্যটির রাজধানীর পরিধি ১০ লি এর কিছু বেশি।[৬] আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭ম-৮ম শতাব্দী নাগাদ তাম্রলিপ্ত নগরীর আবির্ভাব[৭] ঘটলেও এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল মহাভারতের যুগেই। মহাভারতের যুগেই স্বতন্ত্ররাষ্ট্র হিসাবে তাম্রলিপ্তর বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, যে এই রাজ্যের রাজা স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে কুরুপক্ষ অবলম্বন করেছিল।[৮] বর্তমানে তমলুক মহাকুমার সাথে পূর্বের তাম্রলিপ্তর অভিন্নতা সম্পর্কে লোকবিশ্বাসের কথার অনুরূপ আনুমানিক সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে প্রাপ্ত এক বিবরণে লেখা হয়েছে যে, "তাম্রলিপ্তকে চলিত ভাষায় তমলুক বলে।"[৯] কিন্তু ভাষাতত্ত্বের বিচারে "তাম্রলিপ্ত" বা ''তাম্রলিপ্তি" শব্দ বা নামটি থেকে ''তমলুক'' রূপটির উদ্ভব হওয়া মুশকিল। আবার এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে তাম্রলিপ্ত কথাটির বিকল্পনাম- তমালিনী,[১০] তমালিকা,[১১] ইত্যদি।[১২] ভাষাতত্ত্বের বিচারে স্বীকৃত এই তমালিকার মধ্যেই হয়ত ''তমলুক'' কথাটির উৎসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। তমলুকে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলির মধ্যে কয়েকটি মাটির ফলকে উৎকীর্ণ নারী মূর্তির মুখমণ্ডলের অবয়বের সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কোনও কোনও অঞ্চলের নারীদের ঐ দেহাংশের এতই মিল যে সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা তাদের অন্তত কয়েকজনকে চাক্ষুষ দেখেছিলেন বলে মনে হয়।[১৩] এটা সম্ভবপর হলে উপরে উল্লিখিত সময়ে স্থানগুলির সাথে সামুদ্রিক পথে বা বাণিজ্যিক ভাবে তমলুকের প্রত্যক্ষ সংযোগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন পুরাণ, জাতক-কাহিনী ও কথা-সাহিত্য, জৈন সাহিত্য এবং বিদেশী গ্রন্থকারের লেখায় তাম্রলিপ্ত বন্দর ও রাজ্য অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।[১৪] প্রাচীন যুগের সৌভাগ্য-গরিমা বর্তমান তাম্রলিপ্ত বা তমলুকের সর্বাঙ্গে জড়িত থাকলেও তা আজ একটি ক্ষুদ্র শহরে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানের তমলুক অঞ্চলই ছিল প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরী, এই বক্তব্যের সমর্থনে তমলুকে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন এবং তাম্রলিপ্তর নাম সমন্বিত লেখর আবিষ্কার[১৫] বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং একেবারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকলেও পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যর ভিত্তিতে মনে করা যেতে পারে যে, বর্তমান তমলুক অঞ্চলই ছিল প্রাচীন তাম্রলিপ্ত নগরী। ভৌগোলিক মানচিত্রে এর অবস্থান হল ২২°১৫/ উত্তর এবং ৫৬/ পূর্ব অক্ষাংশ।[১৬]

মৎস পুরাণ এবং বেশকিছু চীনা গ্রন্থে তাম্রলিপ্ত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গঙ্গা প্রবাহিত হত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৭] তখনকার গঙ্গানদীর গতিপথ ছিল অনেকটা স্বতন্ত্র, গঙ্গা নদীর এক শাখা রাজমহলের কাছে এসে বাংলাদেশের অভ্যন্তরভাগ দিয়ে পদ্মা নামে পূর্বদিকে চলে গেল। তার অপর শাখা গঙ্গা-ভাগীরথী নামে দক্ষিণাভিমুখে চলে গিয়েছে, কিন্তু ত্রিবেণীর কাছে এই নদী ত্রিধারা বিভক্ত হয়ে সরস্বতী, যমুনা ও ভাগীরথী বা হুগলী নদী নামে পরিচিত হয়েছে। আজও গঙ্গা নদীর জলস্রোত হুগলি দিয়ে প্রবাহিত হলেও অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে এর জলভার সরস্বতীর খাদ দিয়ে সম্ভবত তাম্রলিপ্তর কাছ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়ত। এই বিপুল জলস্রোতের সাথে যুক্ত ছিল রূপনারায়ণ, দামোদর এবং সাঁওতাল পরগণার কিছু নদী, অষ্টম শতাব্দীর পর বা তারও কিছু পূর্ব থেকেই সরস্বতী নদীর মোহনা পলিমাটিতে ভরাট হয়ে উঠতে থাকে যে কারণে তাম্রলিপ্ত বন্দরের গুরুত্বও ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, এর সাথে নদীটির গতিরও কিছু পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল।[১৮] এরুপ সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ষোড়শ শতাব্দীর জাও ডে বারোসের মানচিত্রে এবং অষ্টাদশ শতকের জেমস রেনেলের, Memories of a map of Hindusthan (1779) নামক গ্রন্থে এবং Bengal Atlas (1779-84) নামক মানচিত্রে। আনুমানিক সপ্তদশ শতকের শেষভাগে জগন্মোহন পণ্ডিত রচিত দেশাবলি বিবৃতিতে, রূপনারায়ণ নদীর তীরে তাম্রলিপ্তর অবস্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর কিছু দূরে এক জলধারাকে "গঙ্গাখালি" নামে অভিহিত করা হয়েছে।[১৯] এই 'গঙ্গাখালি' গঙ্গা নদীর একটি শাখার অবশিষ্ট চিহ্ন হতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে জে. রেনেল রূপনারায়ণকে "পুরাতন গঙ্গা" এর কিছু দূরে এক ছোট জলধারাকে "গোঙ্গাকাল্লি" (অর্থাৎ গঙ্গাখালি) নামে চিহ্নিত করেছিলেন।[২০]

তাম্রলিপ্ত বন্দর ও শহর সম্ভবত ইতিহাসের আদি পর্বে বা তারও বেশকিছু কাল আগে থেকেই মেদিনীপুর তথা বাংলার ভাগ্য রচনা করেছে। তাম্রলিপ্তর সঙ্গে নদী ও স্থলপথে উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের যোগ থাকার ফলে বন্দর হিসাবে তার পশ্চাদভূমি ছিল বিশাল। স্বভাবতই উত্তর-ভারতের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছতে হলে- তা রাজধানী পাটলিপুত্রই হোক, অথবা চম্পা, বারাণসী, শ্রাবস্তীই হোক, গঙ্গার সিংহদ্বার-রক্ষী স্বরূপ তাম্রলিপ্তকে অগ্রাহ্য করে যাবার উপায় কারো ছিল না। সুতরাং তাম্রলিপ্তর গৌরবের প্রধান কারণ ছিল এর ভৌগোলিক অবস্থান। এই অবস্থিতির জন্যেই তাম্রলিপ্ত অতি সহজেই জলপথে ও স্থলপথে বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পেরেছিল। সমুদ্র পথে দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা[২১] এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সুবর্ণভূমি (বর্মা বা মায়ানমারের দক্ষিণাংশে), তৌ-খু-লি বা তকোলা (মালয়েশিয়া উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে অবস্থিত এক বন্দর), কো-য়িং (মালয়েশিয়া বা সুমাত্রায় অবস্থিত) এমন কি ফু-নান দেশ (অর্থাৎ কাম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম) অর্ন্তগত ও-কিও এলাকার কোন কোন বন্দরের সঙ্গে এর বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।[২২] এছাড়া তাম্রলিপ্তর সঙ্গে সিংহলদ্বীপ এবং পশ্চিম-ভারতীয় সূর্পারক-ভরূকচ্ছের (বর্তমান সোপারা ও ব্রোচ্) মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকেই ছিল।[২৩] সম্রাট অশোক স্বয়ং এই বন্দরে উপস্থিত হয়ে বোধিদ্রুমের একটি চারা সিংহলে প্রেরণ করেছিলেন।[২৪] চতুর্থ শতকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন[২৫] এবং পরবর্তীকালে সপ্তম শতাব্দীতে ইৎসিংও এই তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।[২৬]

তাম্রলিপ্ত বন্দরের বিরাট পশ্চাদভূমি, নিরাপদ পোতাশ্রয় হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ এবং সমুদ্রের তীর ধরে সুদূর বিদেশে বাণিজ্যিক তথা যোগাযোগ ব্যবস্থার সু-ব্যবস্থা ও স্থলপথে অনুরূপ যোগাযোগের সুষ্ট পরিবেশের জন্য বন্দর হিসাবে এর খ্যাতি ছিল।[২৭] "তাম্রলিপ্ত" অর্থাৎ তামার দ্বারা লিপ্ত কারণ, তামার সংস্কৃত রূপ হলো 'তাম্র', আর 'লিপ্তি' নির্দশ করে লেপন।[২৭(ক)] সে অর্থে নামটি যেন সংশ্লিষ্ট বন্দরে (সিংভূম অঞ্চল থেকে) স্থলপথে তামার আমদানি এবং ঐ স্থান থেকে জলপথে তা রপ্তানির ইঙ্গিত করে। সেইকালে ধলভূম, মানভূম ও পুরুলিয়া বা সিংভূম অঞ্চলে প্রচুর তামা পাওয়া যেত। বর্তমানেও ধলভূম মানভূম অঞ্চলে খনি থেকে তামা উত্তোলন করা হয়।[২৮] প্রাচীন যুগে প্রাথমিক অবস্থায় যেহেতু মানুষ তামা ছাড়া অন্য ধাতুর ব্যবহার

শেখেনি, তাই তামার তৈরী অলঙ্কার এবং তৈজসপত্রের কদর ছিল অপরিসীম। দেশ-বিদেশে তার চাহিদাও ছিল প্রচুর। কারিগরদের তৈরী তামার দ্রব্যাদি বণিকরা বিক্রি করত। মেদিনীপুর জেলার বিনপুর থানার তামাজুড়ি গ্রামের নাম আদিতে হয়তঃ ছিল 'তাম্রযুক্তি' এবং এখানকার অধিবাসীরা হয়তঃ ছিল তামার তৈরী দ্রব্যাদির কারিগর।[২৯] হয়তবা এরূপ বিভিন্ন স্থানের তৈরী তামার জিনিস-পত্র জলপথ ও স্থলপথে এক স্থানে জড়ো হতো - কালক্রমে সেই স্থানের নাম হয়ে দাঁড়ায় 'তাম্রলিপ্ত' বা 'তাম্রলিপ্তি' বন্দর। এই তাম্রলিপ্ত নামটিই নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় তাম্রাশ্মীয়- সভ্যতার অস্তিত্বের দাবীদার। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের প্রচেষ্টায় তাম্রাশ্মীয় পর্বের বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে তমলুক ও তৎসন্নিহিত রূপনারায়ণ তীরবর্তী নানা স্থান থেকে, যেমন, ইছাপুর, অমৃতবেড়িয়া, বাঁকা ও নাটশাল প্রভৃতি স্থানে।[৩০]

তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে খ্রিস্টজন্মের বহু পূর্ব থেকেই তাম্রলিপ্তর বণিক ব্যতীত চম্পা, বারাণসী, কৌশাম্বী অঞ্চলের বণিকারও এই বন্দর দিয়ে সমুদ্রযাত্রা করতেন।[৩১] খ্রিস্টিয় প্রথম শতকে "কোলান্ডিয়া" বা "কোলন্দিয়া" নামক এক শ্রেণীর বৃহৎ জলযান এর পরিচয় পাওয়া যায়, যে সমস্ত জলযান দক্ষিণভারত থেকে গঙ্গা বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করত।[৩২] "সঙ্গর" নামের অর্ণবপোত তৈরির পরিচয় জানা যায় এগুলি জলযানের অনুরূপ। অনেকগুলি কাঠের গুঁড়ি (তক্তা) পরপর (দড়ির সাহায্যে) বেঁধে জলে ভাসানোর উপযুক্ত করা হত।[৩৩] খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী লেখ সমন্বিত এক সীলমোহরে "এপ্যগ" নামে জাহাজের নাম ও ছবি আছে।[৩৪] পেরিপ্লাস ও অঙ্গ বিজ্জাতেও এই শ্রেণীর জলযানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৩৫] পালতোলা জাহাজের ছবি অঙ্কিত বেশ কিছু সীলমোহর পাওয়া গিয়েছে। তৃতীয় শতকের এক চীনা গ্রন্থে তাম্রলিপ্তি সহ বিভিন্ন ভারতীয় বন্দর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালপত্রবাহী জলযানের ধারণা পওয়া যায়। পরিবেশিত তথ্য থেকে মনে হয় জাহাজগুলি ২০০ ফুট লম্বা এবং জলের উপরে ২০ থেকে ৩০ ফুট উঁচু। এতে ৬০০ থেকে ৭০০ লোকের এবং ১০,০০০ হো (চীনের প্রচলিত এক ধরনের মাপ) বা তারও বেশি পরিমাণ দ্রব্যাদি বহন করা যেত। চার পালের জলযানগুলি প্রবল ঢেউ এর বাধা অতিক্রম করে দূরদেশে পাড়ি দিত।[৩৬] ফা-হিয়েন এমন এক জাহাজে চড়ে চৌদ্দ দিনে তাম্রলিপ্ত থেকে সিংহলে পৌঁছেছিলেন।[৩৭] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজকীয় জাহাজ ও তাম্রলিপ্ততে যাতায়াত করত।[৩৮]

সমুদ্রপথে বৈদেশিক বাণিজ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও শ্রীলঙ্কার সাথে এবং স্থলপথে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে তাম্রলিপ্ত বন্দর বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও বন্দর যেমন, কাবেরীপুম্পট্টিনম্ বা নাগপট্টিনম জেলার কাবেরীপট্টিনম বা পুম্পুহার বন্দরের সাথে তাম্রলিপ্তর প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।[৩৯] আবার প্রথম শতকে 'মিলিন্দপঞ্হ' গ্রন্থের এক নাবিকের বঙ্গ, সৌবীর, সুরটঠ, অলসন্দ (ঈজিপ্টের আলেকজান্দ্রিয়া বলে অনুমান করা হয়) প্রভৃতি দেশের বা স্থানের বন্দরে যাবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪০] এপ্রসঙ্গে টি.এন.রামচন্দ্রন তমলুকে তিনটি নকশা উৎকীর্ণ পাত্র আবিষ্কার করেন, যেখানে তিনি পাত্রে উৎকীর্ণ নকশারাজিতে গ্রীক রোমান কালীন ঈজিপ্টের প্রভাব অনুমান করেছিলেন।[৪১] এর থেকে অবশ্য পশ্চিম ভারতের উত্তরাংশের বন্দরগুলি বা ঈজিপ্টের সঙ্গে তাম্রলিপ্তর নিয়মিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রমাণিত হয় না। গান্ধার শিল্পের প্রভাবের ফলে এধরনের মৃৎপাত্র নির্মাণ হয়েছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে। ভারত-রোম বাণিজ্যিক সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলা (বঙ্গ) দেশের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আবার দক্ষিণ ভারতের সাথে রোমান বাণিজ্যের বহু তথ্য বা নিদর্শন আজ প্রমাণিত।[৪২] এ ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতে, বঙ্গের রপ্তানীকৃত দ্রব্য বা দক্ষিণ ভারত থেকে বঙ্গের আমদানীকৃত দ্রব্য রোমান বাণিজ্যের অংশিদার হতে পারত। সরাসরি বঙ্গ-রোমক বাণিজ্যের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৪৩] পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলির (যেমন সৌবীর দেশের বন্দর, ভরুকচ্, কল্যাণ, সিমুল্লা) সাথেও তাম্রলিপ্তর যোগাযোগ ছিল।[৪৪] এই সমস্ত কিছু আলোচনার সমন্বয়ে মনে হয়, তাম্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমে বাংলার (বঙ্গের)

সমুদ্র বাণিজ্য প্রত্যক্ষভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, সিংহল, দক্ষিণ-ভারত কোন কোন ক্ষেত্রে পশ্চিম-ভারতের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। অপ্রত্যক্ষভাবে বঙ্গ, রোমান বাণিজ্যের অংশিদারও হতে পেরেছিল এই বন্দরের সাহায্যে।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি হবে যে, তাম্রলিপ্ত বন্দর ব্যবসায়ের সুযোগ-সুবিধার সিংহদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। তাম্রলিপ্ত থেকে যে সমস্ত বণিকেরা বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গে পাড়ি দিতেন, তাঁরা ছিলেন অসীমসাহসী, সামুদ্রিক বাণিজ্যে লাভের আশায় তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণ ভারত, সিংহল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সমুদ্রগামী বণিকরা পরস্পরের "নিকটবর্তী" হয়ে উঠেছিলেন। সমুদ্রে বাণিজ্য-তরী ভাসাবার পূর্বে বণিকরা দিনক্ষণ নির্ধারণের সাথে জলদেবতাদের তৃপ্তার্থে মূল্যবান দ্রব্য এবং বলি প্রদান করত।[৪৫] একদশ শতকে লিখিত সোমদেবের কথাসরিৎ সাগর-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাণিজ্যে প্রচুর লাভ করার উদ্দেশ্যে তাম্রলিপ্তর বণিকেরা রওনা দেয় লঙ্কা, সুবর্ণ দ্বীপ্, কটাহ বা মালয় উপদ্বীপের কেডা অভিমুখ।[৪৬] বুদ্ধস্বামিনের বৃহৎ কথাশ্লোক সংগ্রহ, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর, ক্ষেমেন্দ্রর বৃহৎকথা-মঞ্জরী গ্রন্থে তাম্রলিপ্তিকে প্রাক্-গুপ্ত যুগের বলে বর্ণনা করা হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে তাম্রলিপ্ত মৌর্যসাম্রাজ্য, প্রাক-গুপ্ত, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে খুব সম্ভবত শশাঙ্কের গৌড় রাজ্য ইত্যাদির অধীন ছিল।[৪৭]

প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত বন্দর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে খ্যাতি লাভ করলেও আন্তর্দেশীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তমলুক এবং এর নিকটবর্তী তিলদায় মৃত্তিকা খনন করে উদ্ধার করা দ্রব্যাদির মধ্যে পোড়ামাটির নির্মিত বিবিধ অঙ্গের ভূষণ, যেমন পঞ্চচূড় কণ্ঠহার, কুন্ডল, বাজু, মেখলা, কবচ প্রভৃতি এবং খেলনাগাড়ি বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র ও পানপাত্র[৪৮] ইত্যাদি যা তৎকালীন মৃৎশিল্প এবং কারুশিল্পের যথেষ্ট উন্নতির পরিচায়ক।

খ্রিস্ট-পূর্ব শতাব্দীর বণিকেরা তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে কি সমস্ত দ্রব্যাদির আদান-প্রদানের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, চীন, সিংহল ও আরব সাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করত তার সুস্পষ্ট কোন আভাস পাওয়া যায় না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বা সমসাময়িক গ্রন্থ এ সম্বন্ধে বেশ নীরব, তবে অনুমান করা চলে, বঙ্গের শুভ্র দুকূল-বস্ত্র মৌর্যযুগে তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে বাইরে রপ্তানি করা হত, মহারাজ অশোকের সময়ে সিংহলরাজ দেবাণমপিয় তিস্স যে-সমস্ত উপঢৌকন পাটলিপুত্রে প্রেরণ করেছিলেন তার প্রতিদানে অশোকও অনেক মূল্যবান সামগ্রী তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে সিংহলে প্রেরণ করেছিলেন।[৪৯] তিনি সিংহলরাজ্যের অভিষেকের জন্য যে সমস্ত সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন তার অন্যতম ছিল সেই 'বস্ত্র যাহা ধৌত করিবার প্রয়োজন হয় না।' রাজ্যভিষেকের জন্য প্রয়োজন হত শুভ্র দুকূল বা সূর্যরাঙা বস্ত্র, যা বঙ্গদেশে প্রস্তুত হত এবং এটা অন্তত এই উপলক্ষে তাম্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমে সিংহলের তৎকালীন রাজধানী অনুরাধাপুরে গিয়েছিল।[৫০] সম্রাট অশোক কর্তৃক প্রেরিত রাজকীয় ছত্রটিও সম্ভবত বঙ্গ দেশীয় দূকূলবস্ত্রে নির্মিত হয়েছিল, কারণ 'বৃহৎসংহিতা'র মতে তা ছিল শাস্ত্রীয় বিধি।[৫১] তবে কেবলমাত্র স্থানীয় বণিকরাই তাম্রলিপ্ত বন্দর এর মাধ্যমে সামুদ্রিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করত না। বহিরাগত বণিকদেরও পরিচয় পাওয়া যায় "দক্ষ ঘোড়ার মালিক" হিসাবে। এই সমস্ত বণিকরা তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে নিয়মিত জাহাজ ভর্তি ঘোড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিয়ে যেত।[৫২]

প্লিনির মতে, বণিজ্যিক লাভের বাসনা ভারতকে রোমান সাম্রাজ্যের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল। এই একই ধারায় বলা যেতে পারে যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে লাভের আশায় তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণ ভারত, সিংহল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমুদ্রগামী বণিকরা পরস্পরের নিকটবর্তী হয়েছিল। কিন্তু নানা রকমের দ্রব্য সামগ্রীর এই আমদানি ও রপ্তানির লাভজনক ব্যবসা তাম্রলিপ্ত বন্দরের মাধ্যমে কতদিন চলেছিল? সপ্তম শতকে সুয়াং-সং এর ভ্রমণকালে তাম্রলিপ্তর সামুদ্রিক বাণিজ্যের অবস্থা ভাল ছিল।[৫৩] যদিও এসময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঘোড়া রপ্তান্তির ব্যবসা উঠে গিয়েছিল। পরবর্তী অষ্টম শতকের দুধপানি লেখতে উল্লেখ করা হযেছে যে, অযোধ্যার

তিন জন বণিক ভ্রাতা তাম্রলিপ্ত বন্দরে গিয়ে বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে স্বদেশে প্রত্যার্তন করেছিল।[৫৪] এই লেখর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, অষ্টম শতাব্দীতে এই সামুদ্রিক বন্দরের গুরুত্ব ছিল।[৫৫] কিন্তু এরপরে অর্থাৎ অষ্টম শতকের পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারতীয় তথ্যসূত্রে তাম্রলিপ্ত বন্দর মারফৎ সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।[৫৬]

তাম্রলিপ্ত বন্দরের বাণিজ্যিক গৌরব ক্রমান্বয়ে অবসান হল। এর পিছনে নানা কারণের সমন্বয় ছিল। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে বাংলায় পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে এর পূর্বে বাংলায় দীর্ঘকাল ধরে মাৎসন্যায় বা অরাজকতা বিরাজ করেছিল। এই অরাজকতার পরিবেশ সুষ্ঠ বাণিজ্যিক আদান-প্রদানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছিল, যেমন 'দশকুমাচরিত'-র এক কাহিনী অনুযায়ী, তাম্রলিপ্তর একজন রাজকুমার কয়েকটি ক্ষুদ্র ও একটি বৃহৎ তরণী নিয়ে গ্রীকদের (যবন) একটি তরণী আক্রমণ করেছিলেন।[৫৭] এই অরাজকতার ফলে তাম্রলিপ্ত বন্দরের বহির্বাণিজ্য দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল এবং এমন এক দুর্যোগের পটভূমিতে চীনা-বাণিজ্যের গতিপথও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। এই বাণিজ্য তাম্রলিপ্ত বন্দরকে উপেক্ষা করে দক্ষিণ-ভারত, সিংহল এবং আবর সাগরের তীরে অবস্থিত দেশগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল।[৫৮] এর সাথে যুক্ত হয় তাম্রলিপ্ত বন্দর গঙ্গার যে শাখার উপরে অবস্থিত ছিল সেই খাত ক্রমশ শুকিয়ে যাবার ফলেই বোধ হয় বিরাট পশ্চাদভূমি থেকে নদীপথে মাল আনা বা পাঠানোর অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। যে কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ব্যবহারযোগ্য সামুদ্রিক পথে এই সময় সমন্দর (চট্টগ্রাম) বন্দরের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পূর্ব ভারতের যে সকল দ্রব্যের চাহিদা ছিল সেগুলির সব কটিই এখানে পাওয়া যেত।[৫৯] ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় এর মতে, "সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বা কোনও হিসাবেই তাম্রলিপ্তির উল্লখ অষ্টম শতকের পর হইতে আর পাইতেছি না। যে নদীর উপরে ছিল তাম্রলিপ্তির অবস্থিতি পলি পড়িয়া পড়িয়া সেই নদীটির মুখ বন্ধ হইয়া গেল অথবা নদীটি খাত পরিবর্তন করিল। তাম্রলিপ্তির সৌভাগ্য-সূর্য অস্তমিত হইল, এবং আশ্চর্য এই, অষ্টম হইতে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বাঙলাদেশে আর কোথাও সামুদ্রিক বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া উঠিল না! চর্তুদশ শতকে দেখিতেছি সরস্বতী-তীরবর্তী সপ্তগ্রাম তাম্রলিপ্তির স্থান অধিকার করিতেছে এবং পূর্ব-দক্ষিণতম বাঙলার নূতন দুইটি বন্দর বেঙ্গলী ও চট্টগ্রাম গড়িয়া উঠিতেছে।"[৫৯(ক)] এইসব কারণের জন্য ক্রমান্বয়ে তাম্রলিপ্ত বন্দরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব হ্রাস পায়। অষ্টম শতকের মধ্যভাগ হতে পাল সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাও এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি। তবে, তার নিশ্চিহ্ন অবলুপ্তির আরো কয়েক শতাব্দী বাকি ছিল। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে বা অষ্টাদশ শতক এর সূচনা এমন সময়ে তাম্রলিপ্ত সম্ভবত এক অন্তর্দেশীয় ক্ষুদ্র বন্দরে পরিণত হয়েছিল, যেখানে আরাকানি মগ ও ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা ক্রীতদাসদের উচ্চমূল্যে বিক্রি করবার জন্য নিয়ে আসত।[৬০]

মধ্যযুগে রূপনারায়ণের তীরবর্তী তমলুকের বাণিজ্যিক গুরুত্ব একেবারে লোপ পেয়েছিল তা বলা যাবে না। কারণ তাম্বোলি (তমলুক) গ্রামে পর্তুগীজদের গীর্জা এবং এক বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।[৬১] অনুমানিক সপ্তদশ শতকে রচিত দেশাবলী বিবৃতিতে লেখা হয়েছে যে, "তাম্রলিপ্ত মহাদেশে ব্যবসায়ী জনের প্রচুর লাভ হয়।"[৬২] সামুদ্রিক বাণিজ্য কেবলমাত্র নানা দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানীর মারফৎ অর্থলাভের সুযোগ করে দেয় না। সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার ওই অঞ্চল তথা বৃহৎ অর্থে ওই দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় অংশে যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচনা করতে সক্ষম। সুতরাং প্রাচীন তাম্রলিপ্তর সামুদ্রিক বাণিজ্যের ইতিহাস চর্চা পূর্ব ভারতের ইতিহাস সাধনার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।[৬৩] যা প্রমান করে খ্রিস্ট-পূর্ব সময়কাল হতেই বাংলার(ভরতের) বাণিজ্যে তাম্রলিপ্ত বন্দরের গৌরবোজ্জ্বল আবদানের কথা।

সার্বিক আলোচনার সাপেক্ষে যদি বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমা অঞ্চল প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর ও বন্দরাঞ্চল হয়ে থাকে তাহলে পাঠক মহোদয়ের কাছে এই প্রাচীন বন্দর সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন রেখে দিতে চাইঃ-

বৌদ্ধগ্রন্থ মহাবংশের বিবরণ অনুযায়ি 307 খীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বেই 'তাম্রলিপ্ত' একটি প্রধান সমুদ্রকূলবর্তী বন্দর বলে বিখ্যাত হয়েছিল। প্রাচীন এই তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে মৌর্য সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচারের উদ্দেশ্যে 260 খীষ্টপূর্বাব্দে(মতান্তরে 261 খীষ্টপূর্বাব্দে) কলিঙ্গ যুদ্ধের পর পুত্র/ভাই মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে বৌদ্ধদিগের আরাধ্য বোধিদ্রুম সিংহলে পাঠিয়েছিলেন(মহাবংশ- 11শ ও 19শ পরিচ্ছেদ)। সমকালে উল্লেখ অনুযায়ী স্থলপথে প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে সম্রাট অশোক এই বন্দরে উপস্থিত হয়েছিলেন। অশোকের রাজধানী মগধ/পাটালিপুত্র যা বর্তমান বিহারের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দীতে অজ্ঞাতনামা গ্রীক বণিকের লেখা গ্রন্থ "Periplus of the Erithrian sea" তে 'তাম্রলিপ্ত' কে একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অনুযায়ি এই বন্দর পরবর্তী কালে গুপ্তযুগেও সর্বপ্রধান বন্দরে পরিণত হয়েছিল। সর্বশেষ উল্লেখ অনুযায়ী পাল-সেন যুগের শেষে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত তাম্রলিপ্ত বন্দরের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় অর্থাৎ ১৩০০ বছরের বেশি এই বন্দর প্রাচীন বাংলার তথা প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহনকারীরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। যেকারনে আমরা সহজেই ধরে নিতে পারি যে তাম্রলিপ্ত বন্দরের বিশাল একটা বন্দরাঞ্চল বা পাশ্চাতভূমি ছিল এবং এই বন্দরের মাধ্যমে গ্রীক ও রোমান দেশের সাথে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার মালয়, জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়া প্রমুখ দেশের এবং দক্ষিন-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের তথা বন্দরের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল অর্থাৎ সর্বোপরি এটি ছিল একটি দেশীয় ও আন্তজার্তিক বন্দর। এতকিছু বলার অর্থ এই হল যে, আলোচ্য মেদিনীপুর জেলার তমলুক অঞ্চলে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়ার 1954-1955খী: এবং 1973-1974 খীষ্টাব্দে উৎখননের ফলে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু এবং এই অঞ্চলে অবস্থিত তমলুক মিউজিয়ামে (তাম্রলিপ্ত সংগ্রহশালা ও গবেষণা কেন্দ্র) রক্ষিত প্রত্নবস্তু খুবই কম যা এই প্রাচীন বন্দরের পরিচয় বহণ করে না। এছাড়া এই বন্দরের একটি বিশাল বন্দরাঞ্চল হবে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে কিন্তু তমলুক বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে এমন কোনো বন্দর বা বন্দরাঞ্চলের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায় নি। চৈনক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ও ইৎ সিং বর্ণিত তাম্রলিপ্ত বন্দরাঞ্চলে অবস্থিত বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ও জৈন বিহার তমলুক মহকুমায় অনুসন্ধান বা উৎখননের দ্বারা আবিষ্কৃত হয় নি। পাঠকবর্গের কাছে আমারও প্রশ্ন; তাহলে কোথায় অবস্থিত ছিল প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর?

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এই প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে ড. তপন কুমার দাস (প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), এর অবদান অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র:

১. রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৬(সপ্তম সংস্করণ), পৃ. ২৯৫

১ (ক). শুই-চিং-চু গ্রন্থে উদ্ধৃত ফু-নান-চুয়ানের অংশ বিশেষ, এল.পেতেচ, নর্দান ইন্ডিয়া একরডিং টু শুই-চিং-চু, পৃ. ৫৩

২. মাইতি বাসুদেব, তাম্রলিপ্তঃ বন্দর ও রাজ্য ইতিবৃত্ত, রম্যাণি পাবলিশার্স, মেদিনীপুর, ১৯৯২, পৃ. ৫

৩. হিয়েন-ফা, ফো-কুও-কি, পৃ. ৩৭

৪. সাং-সুয়ান, সি-ইউ-কি, চুয়ান, পৃ. ৩৭

৫. Indian Archaeological review, 1954-55, P. ২০, & 1973-74, P. 33

৬. রায় প্রণব, মেদিনীপুর জেলার প্রত্ন-সম্পদ, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ , কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ১৪৩

৭. Das Binodshankar, *The Port of Tamralipta in Fiction and History, Studies in Indo-Asian Art and Culture,* 1987, p. 219-241

৮. দাস বিনোদ শঙ্কর ও প্রণব রায়, মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৩৪

৯. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলকাতা, ৫৫ তম বর্ষ, ১ম, ২য় সংখ্যা, ১৩৫৫, পৃ. ১২-১৩, এবং মাণিকলাল সিংহ, সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬০-১৬৬

১০. হেমচন্দ্র, অভিধান- চিন্তামণি, পৃ. ৪, ৪৫, হরগোবিন্দ শাস্ত্রী সম্পাদিত সংস্করণ, পৃ. ২৪২

১১. মজুমদার ডাঃ রমেশচন্দ্র, বাংলা দেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড (প্রাচীন যুগ), কলকাতা, ২০১৪ (দশম সংস্করণ), পৃ. ১০। এবং "তমালিকা" রূপটি বাচ্যস্পত্যে দেখা যায়।

১২. মাইতি ডাঃ সুকুমার, তাম্রলিপ্তির উপভাষা, জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১ "তাম্রলিপ্ত" বা "দামলিপ্ত" নামের সঙ্গে "দ্রমিল" বা "তমিল" নামের যোগের কল্পনা করার ঐতিহাসিক যুক্তি নেই (এই টীকাতে উক্ত গ্রন্থের পৃ. ৪-৫ দ্রষ্টব্য)।

১৩. এই রকমের দুটি বা তিনটি মাটির ফলক তাম্রলিপ্ত মিউজিয়াম ও রিসার্চ সেন্টারের সংগ্রহে আছে।

১৪. Das Binodshankar, *The Port of Tamralipta in Fiction and History, Studies in Indo-Asian Art and Culture,* I, p. 219-241

১৫. কে. রুদ্র, "তাম্রলিপ্ত অ্যান্ড ইটস লোকেশনাল প্রবলেম" হিস্টোরিক্যাল আর্কিওলজি অফ ইন্ডিয়া-এ ডায়লগ বিটুইন আর্কিওলজিস্টস অ্যান্ড হিস্টোরিয়ানস্, এ.রায় ও এস.কে.মুখার্জী (সম্পা.), পৃ. ২৪৫-২৫৪, এবং রঙ্গনকান্তি জানা, "দি লোকেশন অফ এনসেন্ট তাম্রলিপ্তি" , জার্নাল অফ এনসেন্ট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, ভলিউম নং ২০, পৃ. ৭৩-৭৭

১৬. দাস বিনোদশঙ্কর ও প্রণব রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

১৭. শুই-চিং চু, অনুচ্ছেদ নং ৫৩, ফা-হিয়েন, উপরোক্ত গ্রন্থ, ৩৭, মৎসপুরাণ, ১২১, ২৭ ইত্যাদি, বায়ুপুরাণ (রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পা.), পৃ. ৩৫৮।

১৮. দাস বিনোদশঙ্কর ও প্রণব রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৪

১৯. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৫৫, পৃ. ১৬

20. James Rennell, Memoir of a map of Hindustan or the Mogul Empire: with an Introduction, Illustrative of the Geography and Present Division of that country,kessinger Publishing,reprint-2010,p. 8-9, map no. 66,88, & 7

২১. হিয়েন -ফা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭ ও ৪০, সমন্ডপাসদিকা (পালি টেক্সট সোসাইটি সংস্করণ)

২২. মুখার্জী বি.এন, খরোষ্ঠী অ্যান্ড খরোষ্ঠী ব্রাহ্মী ইনসক্রিপশন্স ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ১৭-১৮, ৩৪ এবং ৩৮, এই সম্পর্কে আরও দ্রষ্টব্য এস.লেভী (সম্পা.) মহাকর্ম বিভঙ্গ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৫৪৩, ৫৪৪

২৩. পালিগ্রন্থ দীপবংশ ৯.১ এবং মহাবংশ ৬.১, এছাড়া Binodshankar Dash, *The Homelands of Prince Vijayasimha- A re-assessment of the story,* 'Journal of the Asiatic Society', IX, no. 2 1967, P. 64 & 74

24. Chaudhuri Rita, Tamralipti: A Celebrated Port of Ancient Bengal, Journal of Ancient Indian History, Kolkata, vol. XIV, 1983-85

25. Chakrabarti Dilip Kumar, N. Goswami and R. K. Chattopadhyay, Archaeolory of Coastal West Bengal: Twenty-four Parganas and Midnapur Districts, Cambridge (U.K), 1994. P. 156 & 157

২৬. সেনগুপ্ত গৌরাঙ্গগোপাল, প্রাচীন ভারতের পথ-পরিচয়, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৬৭ এবং I-tsing, *A Record of the Buddhist Religion* (Tr. Takakusu).

২৭. সোয়াং-সাং-এর মতে "যে খাঁড়ির উপরে তাম্রলিপ্ত অবস্থিত সেখানে জলপথ ও স্থলপথ মিলেছে। ফলে ওখানে নানা দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান দ্রব্য পাওয়া যায়।" বৃহৎ-কল্প ভাষ্যে জলপথ ও স্থলপথ মারফৎ তাম্রলিপ্তিতে বাণিজ্য দ্রব্য আমদানির কথা লেখা হয়েছে (১,১০৯০)।

২৭ (ক). মোহা. মোশাররফ হোসেন, আদি ঐতিহাসিক মুদ্রার ইতিহাস, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬২

২৮. মাইতি বাসুদেব, তাম্রলিপ্তঃ বন্দর ও রাজ্য ইতিবৃত্ত, রম্যাণি পাবলিশার্স, মেদিনীপুর, পৃ. ১১

২৯. মাইতি বাসুদেব, তদেব, পৃ. ১১

৩০. রায় প্রণব, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

৩১. শঙ্খ জাতক (নং ৪৪২), মহাজনক জাতক (নং ৫৩৯) প্রভৃতি।

৩২. *Periplus of the Erythraean Sea,* Sec. 60.

৩৩. পেরিপ্লৌস, অনুচ্ছেদ নং ৬০

৩৪. মাইতি বাসুদেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৩৫. পেরিপ্লৌস, অনুচ্ছেদ নং ৪৪, অঙ্গবিজ্জা, অনুচ্ছেদ নং ৩৩, ৫।

৩৬. থাই-সি-য়ুৎ-লাল, অধ্যায় নং ৭৮৩, ৭৯৩ ও ৯৬০, 'Journal of the Malayan branch of the royal Asiatic Society', part no. 31, number no. ২, p. 38. হুই-লিনের "শব্দ কোষ" অনুযায়ী "পো" নামের জলযানগুলি খুন-লুন-পো নামেও পরিচিত ছিল। এগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার খুন-লুনদের তৈরি (Buletin of the oriental and African studies,part no.19,p.347-348) .

৩৭. ফা-হিয়েন, উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৭

38. Je Takasu, A record of the Buddhist religion and practiced in India and the Malay archipelago, oxford, 1896, p. 29-31, 34-35 and 211

৩৯. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ বঙ্গাল ও ভারত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১২

৪০. মিলিন্দপঞ্হ পৃ. ৬, ২১, ৩৬০

৪১. আর্টিবুস এশিও, খন্ড নং ১৪, পৃ. ২৩৪-২৩৫

৪২। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৪৩. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০ এবং স্টাডিজ ইন আর্কিওলজি, পৃ. ৩০৭

44. Ranabir Chakravarti, Maritime Trade and Voyages in Ancient Bengal, Journal of Ancient Indian History, Kolkata, vol.XIX, 1989-90, P. 148.

৪৫. বৃহৎসংহিতা, অনুচ্ছেদ নং ৪।৮, ৭।৬ এবং ১০।১০ ।

৪৬. সি.এইচ. টন, দি ওসান অফ স্টোরিজ (এন. এম. পেনজার সম্পা.) খন্ড নং ১, পৃ. ১৫৫, খন্ড নং ২, পৃ. ৭২, খন্ড নং ৩, পৃ. ১৭৫

৪৭. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১, ১৩

48. P.C.Dasgupta, *The Early Terracottas of Tamralipta,* D.P. Ghosh, Studies in Museum and Museology in India-এই গ্রন্থগুলির প্রদেয় চিত্রগুলি দ্রষ্টব্য।

৪৯. মহাবংশ অনুচ্ছেদ নং ১১, পৃ. ২০-৩৩

৫০. বিনোদশঙ্কর দাশ ও প্রণব রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২

৫১. বৃহৎসংহিতা, অধ্যায় ৭৩, ছত্রলক্ষণম্। ভারতে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই প্রকার ছত্রই রাজগণের জন্য ব্যবহৃত হত।

52. B.N. Mukherjee, "Trade, traders and media of exchange on pre-Gupta Banga", coinage, trade, and economy (secretary: A.K. Jha), p. 46.

৫৩. সুয়ান-সাং, সি-ইউ-কি, চুয়ান, পৃ. ১০

৫৪. এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, খন্ড নং ১, পৃ. ৩৪৫

৫৫. আনুমানিক অষ্টম শতকে হরিভদ্র রচিত "সমরাইচ্চ-কহা" তে তামলিত্তী থেকে দুই মাসের মধ্যে বাণিজ্য ব্যাপদেশে সুবর্ণ ভূমিতে সমুদ্রপথে পৌঁছাবার ইঙ্গিত করা হয়েছে (নির্ণয় সাগর সংস্করণ, খন্ড নং ১, পৃ. ৩২৭-৩২৮, ৫, ১৪৪, ৫ ইত্যাদি)। অবশ্য এই কাহিনী বা তথ্যের উৎস প্রাক-অষ্টম শতকের হতে পারে।

৫৬. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ বঙ্গালা ও ভারত, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৪

৫৭. বিনোদশঙ্কর দাশ ও প্রণব রায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

৫৮. এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য কিয়াতন কর্তৃক বিরচিত চীন সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক তথ্য সম্বন্ধীয় মূল্যবান গ্রন্থ (আনুমানিক ৮০০ খ্রিস্টাব্দ) এতে সুদূর প্রাচ্য থেকে বঙ্গোপসাগর এবং উহার পরপারের দেশগুলিতে জলপথে যাবার অনেক তথ্য প্রদত্ত হয়েছে।

59. Indian Museum Bulletin, part 17, 1982, p. 73-74 & 77-78

৫৯(ক). নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৬(সপ্তম সংস্করণ), পৃ. ১৬৪।

60. Ms. Bodleian, 589, Sachau and Etches catalogue entry 240, translated by J.N. Sarkar, Journ. As Soc. Beng., June, 1907.

61. L.S.S and Mali, Medinipur district Gazetteer, p.26-27

৬২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলকাতা, ১৩৫৫, পৃ. ১

৬৩. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ বঙ্গাল ও ভারত,প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৫